OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 439 - 446
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 439 - 446
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর ‘লক্ষ্মীর জাগরণ পালা’ কাব্যে আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালি : একটি আলোচনা

পূজা দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: rspujadas99@gmail.com
0009-0002-6815-9272

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Hunger, Caste discriminations, Eighteen century, Bengal and Bengalis, Social Norms, Culture, Poverty, Religious situation, Economic condition.

Abstract
Nityananda Chakraborty's poem 'Lakshmi's Jagaran Pala' is one of the historical documents for understanding the history of Eighteen century Bengal. From this poem, we can know exactly what kind of condition the people of Bengal were in before the 'Chiyattorer Manbantar'. It is very unusual for the people of Bengal to not be able to eat in a place where so many types of rice are produced. It cannot be said that this famine was caused by a natural disaster alone. The then political chaos in the country was largely responsible for this. At that time, the pain of not being able to eat for everyone, regardless of caste and creed, and of being hungry in every household has been discussed repeatedly in the poem. Be it Dhanya or Krishna Sharma. Even in this most difficult situation, the people of Bengal retained their own culture, customs and integrity, etc. are reflected in the pages of this poem. In the two parts of this poem by Nityananda, on the one hand, Dhanya-Kamala's hunger pangs, social norms, caste discrimination, religious beliefs, etc. are expressed in the poem, on the other hand, Krishna Sharma's extreme suffering, despite not eating for three days, maintaining his mental balance, maintaining his culture, and sense of humanity in both states of happiness and sorrow, etc. are revealed in the poem. This is not just the story of Dhanya or Krishna Sharma, but the same situation in almost all homes in contemporary Bengal. What the poet saw at that time has found written form in the poem. Therefore, like other Mangal kavyas, this minor Mangal kavya has also become an important social mirror of Bengal at that time. The expression of grief by Dhanya, the pain of not being able to eat, the arrival of a new guest, the relaxation of caste discrimination at the hands of Goddess Lakshmi, and the propagation of the theory that work is the real truth, on the other hand, Krishna Sharma's inability to eat despite being a Brahmin, his poverty and hardship, and his not forgetting Krishna even after suffering happiness - all these aspects can be seen in the poem, which help us understand Eighteen century Bengal and Bengalis. The present article explores the existence of Eighteen century Bengal and Bengalis through

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 439 - 446
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

analyzing the thoughts and lifestyles of all these characters described in the poem. In addition, the events described in the description of Goddess Lakshmi, called Kaliyuga, are actually a reflection of the contemporary society seen by the poet. The present article sheds light on the fact that the events described in the description of Goddess Lakshmi are actually a reflection of the contemporary society seen by the poet.

Discussion

শতক বলতে একটি মাত্র ধ্যান-ধারণায় আবদ্ধ সময়কে বোঝায় না। একটি শতকের মধ্যে লুকিয়ে থাকে ব্যক্তিবিশেষের নানান কর্মকাণ্ড, সামাজিক বহু পরিবর্তন, রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, ধর্মীয় সংকট প্রভৃতি। তেমনি মঙ্গলকাব্যের দীর্ঘ যাত্রাপথে সঙ্গে আনুমানিক পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস জুড়ে রয়েছে। আমরা জানি, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি লিখিত হয়েছে এবং সমকালীন যুগের প্রভাবশালী দর্পণ হিসেবে ছাপ রেখেছে তা হল মঙ্গলকাব্য। প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্য তাই দেব-দেবীদের কথার আড়ালে আরো একটিবার নিজের কথা বলে, নিজের সময়ের কথা বলে, বাংলার মানুষদের কথা বলে। বর্তমান কাব্যও যেহেতু আঠারো শতকের সময়পর্বে লেখা হয়েছে সেহেতু এই কাব্যের মধ্যেও সমকালীন বাংলার নানান দিক আলোচিত হয়েছে। কবি নিত্যানন্দের 'লক্ষ্মীর জাগরণ পালা' কাব্যটি মূলত দুটি পালায় বিভক্ত প্রথম পালার নাম – 'ধন্যা চন্ডালের পালা', দ্বিতীয় পালাটি 'তিল ভঙ্গ পালা' নামে পরিচিত। কালজ্ঞাপক ভণিতা থেকে প্রাপ্ত এই কাব্যটির রচনার সময়কাল হল ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ। বাংলার ইতিহাসে এক ভয়াবহ ও মর্মান্তিক সময়পর্বের সাক্ষী এই কাব্যটি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পূর্ববর্তী বাংলার মানুষদের খেতে না পাওয়ার যন্ত্রণা তাই কাব্যের দুটি পালাতেই প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমেই 'ধন্যা চন্ডালের পালা'র কাহিনী আলোচনা করা যাক। এই পালাটি ৩৭টি লেচাড়ি বা অধ্যায়ে বিভক্ত। লক্ষ্মী যিনি বাংলার ধন-ধান্যের দেবী, যাঁর কৃপায় বাংলার ঘরে ঘরে অফুরন্ত ধন ও খাদ্যের ভান্ডার সমৃদ্ধ থাকে, সেই দেবীকে এই দুর্ভিক্ষের সময়ে বাংলার মানুষদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যখন চারিদিকে একমুঠো অন্নের জন্য মানুষদের মধ্যে এতো হাহাকার তখন দেবী লক্ষ্মী পারেন সকলের দুঃখ মোচন করে তাদের এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলার সেইসব মানুষদের কথাই আলোচিত হয়েছে যা কবি দুটি পালার মধ্যে দিয়ে বারে বারে বোঝাতে চেয়েছেন।

মানুষ যে জাতে জন্মগ্রহণ করুক না কেন পেটের খিদে সকলকে সমানভাবে আঘাত করে থাকে। বহুযুগ ধরে চলে আসা জাতিগত ভেদাভেদ এই আঠারো শতকে এসেও যে, শেষ হয়ে যায়নি তার প্রমান পাওয়া যায় ধন্যার নিজের জাত নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। এই জাতে জন্ম নিলে স্বয়ং কৃষ্ণও তার দিকে তাকায় না এমন ধারণা মনে জন্ম নেয় ধন্যার। তাই ধন্যা খিদের জ্বালায় কৃষ্ণকে আক্ষেপ করে বলছে -

"ওহে কৃষ্ণ তুমি নাকি জগতের নাথ।
জগত বাহিরে বুঝি মোরে কৈলে জাত।।"[১]

সমাজে চন্ডাল জাতি হিসেবে জন্মগ্রহণ করা যে, কতটা যন্ত্রণাদায়ক চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। এ শুধু ধন্যার একার কষ্ট নয়, আপামর চন্ডাল জাতির বেদনা। বর্ণভেদে এ জাতি এতটাই হীন যে তার ছায়া মারাতেও কেউ চায় না। হিন্দু সমাজে মান্যতা প্রাপ্ত মনুসংহিতা শাস্ত্রে এ চন্ডাল জাতি সম্পর্কে মনু বলছেন -

> "চন্ডাল এবং চন্ডাল বিশেষ যে শ্বপচ জাতি, ইহাদিগের গ্রামের বাহিরে বাস হইবে। ইহা- দিগকে জলপাত্রাদিরোহিত করিবে। কুক্কুর ও গর্দ্দভ ইহাদিগের ধন, ইহারা শববস্ত্র পরিধান, ভগ্নপাত্রে ভোজন, লৌহের অলঙ্কার ধারণ করিবে...।"[২]

এ থেকে বোঝা যায় চণ্ডাল জাতির মানুষদের দৈনন্দিন জীবন কাটানো কতটা কষ্টকর এবং যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে ধন্যা তার একটি উদাহরণ মাত্র।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 439 - 446
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দিনের পর দিন খিদের জ্বালাকে সহ্য করে অভুক্ত থেকে যখন ধন্যা-কমলার নাজেহাল অবস্থা, তখন যেকোনো মানুষের তাদের কাছ থেকে একটু খাবার পাওয়ার আশা যে তাদের খিদের জ্বালাকে আরো বাড়িয়ে দেবে এটাই স্বাভাবিক। তাই কমলা এই খিদের জ্বালাকে বুকে নিয়ে ক্রোধে ব্রাহ্মণী বেশে থাকা লক্ষ্মীদেবীকে বলতে বাধ্য হয়েছে -

"বুড়ির ব্যগ্রতা দেখি কমলা কুটীরে থাকি
ক্রোধে কাঁপ্যা কহে কটুবর।
পড়্যা মরে চক্ষু নাই কোন লাজে এই ঠাঁই
দেখিয়্যা আইলে কুড়্যা ঘর।।"[৩]

যেখানে তাদের নিজেদেরই খাবার পাওয়ার কোন আশা নেই সেখানে অন্য কাউকে খেতে দেওয়ার কথা ভাববার মেজাজ এবং পরিস্থিতি দুটোই ছিল না। এই খিদের কষ্ট শুধু ধন্যা-কমলার একার নয়, তৎকালীন সকল অস্পৃশ্য তথা বঞ্চিত মানুষদের যন্ত্রণা।

কবি নিত্যানন্দ যেসময় বসে কাব্যটি লিখছেন তখন বাংলায় নবাবী আমলের শেষ পর্যায়। বাংলায় মোগলদের আধিপত্য বিস্তারের পর বাংলার মানুষদের শুধুমাত্র বাইরের সাজ-শয্যায় নয় তাদের অন্দরমহলেও নানান বিষয়ের পরিবর্তন ঘটে। মোগলদের বাংলায় আসার পর বাংলার মাটিতে কিছু অর্থকারী ফসলের চাষ বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে অন্যতম হল আখ। এই আখ থেকে তৈরি হত চিনি, যা মোগলদের হালুয়া জাতীয় মিষ্টি খাবারের অন্যতম সামগ্রী ছিল। তাই চিনির চাহিদা এই সময় খুব বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষদের পক্ষে এই চিনি কিনে খাওয়া সম্ভব ছিল না, আর এই অবস্থাকে বোঝাতেই যেন ব্রাহ্মণীবেশি লক্ষ্মীদেবী ভক্ত ধন্যার দেওয়া কলমি শাকটুকু পরম আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে বললেন -

"বুড়ী বলে বাছা মোর বাঁচালে পরানি।
কলমীর শাক নহে দিলে খন্ড চিনি।।
স্বর্গের দুর্লভ সুধা যারে নাহি ভায়।
ভক্তি স্নেহেতে লক্ষ্মী কলমিপত্র খায়।।"[৪]

সে সময়ে চিনি যে কতটা মূল্যবান বস্তু এই কথা থেকে তা ধরা পড়ছে।

বাংলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য হল ধান। বাংলায় যত প্রকারের ধান উৎপন্ন করা হয়, যা পৃথিবীর আর কোন দেশে এত প্রকারের ধান পাওয়া যায় না। শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, [১১০০-১৯০০খ্রী]' গ্রন্থটিতে বাংলার ধান সম্পর্কে খুব সুন্দর কথা বলেছেন -

> "বাঙলার চাষীর প্রধান সম্বল ছিল ধান; সে ফসল ফলত অজস্র। আর ধানও এত রকমের যে তার এক একটি রকমের একটি ধান নিলেও একটা মস্ত বড় পাত্র ভরতি হয়ে যেত।"[৫]

আঠারো শতকেও বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি কৃষিজাত দ্রব্যের উপরই নির্ভরশীল ছিল, আর ধান তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান দ্রব্য ছিল তারই প্রমাণ পাওয়া যায় কবি নিত্যানন্দের এই কাব্যের মধ্যে যখন দেবী লক্ষ্মী কুবেরের কাছ থেকে হনুমানকে ধান আনতে বলে তখন যত প্রকারের ধানের নাম পাওয়া যায় তা আমাদের বাংলার শ্রেষ্ঠ শস্যধানের মাহাত্ম্যকে যেন তুলে ধরে। যেমন -

"বিশ্বকর্মা হনুমান সঙ্গে সিন্ধু সতা হিন্দু সিন্দুক সুতা
কহেন ধানের নাম শুনো যত শ্রোতা
বল দাঁড় বাঁকই বকুলি বরাই বঙ্গি।
রাম শালী রড়া মাটীয়া রায়ভোগ রাঙ্গি।।"[৬]

এছাড়া, কলমিলতা, কপিলাভোগ, কেতকী, কালাজিরা, খয়রাশালি, খেজুরা, নারকলি, পানিকলষ, জটাধর প্রভৃতি প্রায় একশোরও বেশি ধানের নাম পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায় সেসময় ধানের ফলনে বাংলা সত্যি যে সোনার বাংলা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 439 - 446
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই কাব্যের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রসঙ্গ তথা ধর্মীয় স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় যা তৎকালীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থাকে পরিস্ফুটিত করে। রবি দত্তের দ্বারিকাপুরে যাবার পথে যে সকল স্থানের নাম এবং সে স্থানগুলি জুড়ে বিশেষ ঘটনা উল্লেখ পাওয়া যায় তা বাংলার আঠারো শতকের ধর্মীয় ছবিকে অঙ্কিত করে। সেসময় কাশি থেকে দ্বারিকাপুরে যেতে জলপথে কোন কোন স্থানগুলিকে অতিক্রম করতে হত তার ভৌগলিক পরিচয়ের আভাসও সেখানে পাওয়া যায় -

"কনকঅঞ্জলি দিয়া সুরধনী ঘটে।
প্রয়াগে প্রবেশে আসি বায়্যা দিলা আটে।।
স্নান করি প্রয়াগে মুড়ায়্যা সবে মাথা।
সঙ্কেতে মাধব বন্দ্যি কয়া তত্ত্বকথা।।
বাঞ্ছা কল্পতরু বটে কোরা আলিঙ্গন।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া আইল ভদ্রা কদম্ববন।।
দেব পিতৃগণে তুষ্যা শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানে।
সরস্বতী বন্দিয়া করিয়া প্রাত স্নানে।।"[৭]

আঠারো শতকেও যে যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম জলপথ ছিল তারই প্রমাণ পাওয়া যায় এ কাব্যে। তাই দেবীর আদেশে গজলক্ষ্মীকে আনতে রবি দত্তকে পাঠালে নৌকা প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেয় রবিদত্ত। যথা -

"শীঘ্রে আসি নিকেতনে কান্ডার খল্লনগনে
ডাক্যা নৌকা ঐমনি সাজায়।।"[৮]

যুগ যুগ ধরে চলে আসা কিছু সামাজিক ধর্মীয় বিশ্বাস যা হিন্দু সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে আসছে তেমনি কিছু প্রসঙ্গ দেখতে পাওয়া যায় এ কাব্যে। শুভ অশুভের বিষয়ে মানুষ আলাদা করে শিখে আসে না এ চলতি বিশ্বাস যা তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করে নিয়ে আসে এমনই একটি মঙ্গলময় প্রার্থনা যা পদ্মাবতীর, স্বামীর কাজের সূত্রে বাইরে যাওয়ার আগে কিছু আচার-নিষ্ঠা পালনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। যথা -

"কাজির দক্ষিণ তটে ভাগীরথী স্নান ঘাটে
সাধুর রমণী পদ্মাবতী।
পূজে গঙ্গা সুরেশ্বরী মঙ্গলিয়া দিল তরী
সঙ্গে লইয়া সতেজ যুবতী।।
প্রণমিয়া মধুকরে পদ্মা আইল নিজ ঘরে
দ্বিজ সঙ্গে সাধু বেশে যায়।"[৯]

এছাড়া কাব্যে রবি দত্তের গজলক্ষীকে আনতে যাওয়ার পথে অসংখ্য তীর্থস্থানের দর্শনের প্রসঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়, যা তৎকালীন বাঙালির সে স্থানগুলির প্রতি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চিন্তাভাবনার ছবিকেই যেন চিত্রায়িত করছে। যেমন - বৃন্দাবন ভ্রমণকালে পথে পড়ছে -

"বামেতে মথুরা হ্যেরা হইয়া আনন্দিত।
সাধুকে কহিয়া যত কংসের রচিত।।
মহানন্দে দানখন্ড মান খণ্ড বায়া।
গঙ্গেশ্বর প্রনমিয়া সূর্য গঙ্গা দিয়া।।
রাধাকুন্ড শ্যামকুন্ডু করা দরশন।
আনন্দে বন্দিয়া সবে গিরি গোবর্ধন।।"[১০]

এরপর তাঁরা তিনদিন পর দ্বারকাপুরী পৌঁছায়, এই স্থান সম্পর্কে কবি বলছেন -

"স্বর্ণময় লঙ্কা যেন সমুদ্রের মাঝে।
জলের মধ্যেতে যে দ্বারকা পুরি সাজে।।"[১১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 439 - 446
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাব্যের এক অংশে দেখতে পাওয়া যায় ধন্যা-কমলার রাতে ঘুমোনোর সময় লক্ষ্মীদেবী তাঁদের সোনার মহল তৈরি করে দেয়। সোনার অলংকারে তৈরী বাড়ি দেখে কমলার মনে হয় বাড়িতে বোধহয় আগুন লেগেছে -

"রত্নময়পুরী যত করে ঝলমল।
কমলা বলে হায় কুড়্যায় লাগেছে অনল।।"[১২]

এর মধ্যদিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে তাঁদের মত মানুষের কাছে সর্বদা একটি ভয় লেগেই আছে, আরো কোনো বিপদ বুঝি তাঁদের জীবনে নেমে আসছে, আরো কিছু বুঝি তাঁরা হারাতে বসেছে।

আমরা জানি সমাজের মধ্যে থাকতে হলে তার কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয় সকলকেই। একটি পরিবারের মধ্যে পুরুষ অর্থনৈতিক দিক সামলাবে, আর নারী তার পরিবারকে যত্ন, ভালোবাসা দিয়ে সংসারকে টিকিয়ে রাখবে এটাই সমাজ বলে আসছে। আঠারো শতক এমন একটি সময়পর্ব যেসময় নারীদের পথভ্রষ্ট হওয়ার সুযোগ ছিল অনেক বেশি। বাইরে নানান প্রলোভন থেকে দূরে রাখতে বাংলার লক্ষ্মীমন্ত বউ, মেয়ে বলতে ঠিক কাদের বোঝায় তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই মঙ্গলকাব্যগুলি। তাদের মা, ঠাকুমাদের চরিত্র ঠিক কেমন ছিল, কাকে আমরা লক্ষ্মীমন্ত স্ত্রী বলে জানবো এরই উত্তর তথা মেয়েদের জীবনধারণের সঠিক পথের দিকনির্দেশক বলা যেতে পারে এই লক্ষ্মীমঙ্গল কাব্য। লক্ষ্মীব্রত যেহেতু নারীরা পালন করে থাকে সেই সব নারীদের উদ্দেশ্যে কিছু সতর্ক বাণী এই কাব্যে আলোচিত হয়েছে। দেবীর কৃপা পেতে হলে কোন কোন নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ দেবীলক্ষ্মী নিজে কমলাকে বলছেন। প্রথমে কি করনীয় তা বলছেন দেবী -

"প্রভাতে উঠিয়া যেবা দেয় ছড়া ঝাটি।
তৃপ্ত হয়্যা ত্রিসন্ধ্যা থাকি যে তার কাটি।।
তুলসির সেবা করে পালে রবিবার।
আমাবস্যা একাদশী না করে আহার।।"[১৩]

রবিবারে তুলসীগাছে জল না দেওয়া হিন্দু শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী, এছাড়া আমাবস্যা এবং একাদশীতে উপোস থাকার প্রসঙ্গ এগুলো যে সমকালীন বাঙালির নিত্য মেনে চলা কর্মকাণ্ড তা বোঝা যায়। এছাড়া দেবী বলছেন -

"পদ্য আছি বিচিত্র লেখিয়া রাখে দ্বারে।
শ্বেতাম্ব কুঞ্জর আর সুশ্বেত চামরে।।"[১৪]

সমকালীন সময়ে সমাজে হিন্দু ও মুসলমান দুজনের বাড়িঘর চিহ্নিত করতেই যেন এই ব্যবস্থা। বাঙালি সংস্কৃতির পরিচায়ক।

এরপর দেবীলক্ষ্মী কমলাকে যা যা করতে নিষেধাজ্ঞা করেছে তা আমাদের সমাজেরই অলিখিত কিন্তু কঠোরভাবে মেনে চলা মেয়েদের উপর বরাদ্দ কিছু নিয়ম যা আজও বর্তমান সমাজে নারীদের মেনে চলতে হয়। দেবীলক্ষ্মী কমলাকে বলছেন-

"মহালক্ষ্মী বলে শুন কমলাসুন্দরী।
হত লক্ষ্মী যাহার চরিত্র পরিহরি।।
অলক্ষণা যেই নারী প্রভাতে না উঠে।
শয্যায় শুহিয়া থাকে মোর প্রাট ফাটে।।"[১৫]

আরো বলছেন -

"মৎস্যপুড়ি খায় যেবা সিদ্ধ করে ধান।
শতজন্ম যে জনা আমারে নাহি পান।।"[১৬]
"জবতাপ করা পথে চলে যেই মেয়্যা।
নিশাকালে নিদ্রা যায় উলঙ্গ হৈয়া।।"[১৭]

এই সকল বিধিনিষেধগুলো আজও নারীরা মেনে চলছে, এগুলো দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক নিয়মরীতি যা সমাজের তলে তলে আজও বয়ে চলেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 439 - 446
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাব্যের শেষে দেবী লক্ষ্মীকে দিয়ে কবি নিত্যানন্দ কলিযুগের যে বিশেষ বর্ণনা দিয়েছেন, তা আসলে কবির নিজের চোখে দেখা সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। যা থেকে সহজেই ধরে নেওয়া যায় সেসময়ের বাংলার বাস্তবিক অবস্থার স্বরূপটিকে। বাংলার মানুষজন সমকালীন সময়ে কেমন অবস্থায় ছিল বাংলার চারপাশে যে অরাজকতার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সে সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। যেমন এক জায়গায় দেবী বলছেন -

"ব্রাহ্মণ যবন সঙ্গে একত্র বসিয়া রঙ্গে
বিশ্বাই বিভাগে দিবে মন।
না ভাবিবে নারায়ণে সদা মত্ত সুরাপানে।
দেবকার্য্যে দিয়া ত্যেয়াগণ।।"[১৮]

মোগলযুগ থেকে সুরা শুধুমাত্র রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য নয়, বাংলার সাধারণ মানুষদের কাছেও অবসর বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আঠারো শতকেও তার অন্যথা দেখতে পাওয়া যায়নি। সেসময় মানুষজন যে নিজস্ব নিয়ম-নিষ্ঠা ভুলে গিয়ে বিলাসিতায় ডুবে থাকতো তারই প্রমাণ পাওয়া যায় এই বর্ণনা থেকে। কলিযুগ সম্পর্কে আরো বলছেন -

"বিপ্র হবে বোধহীন শূদ্র হবে বিচক্ষণ
যবন পালিত হবে রাজ্য।।"[১৯]

কবি যা দেখবেন তাই কাব্যে প্রতিফলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। সেসময় বাংলার চারপাশে মুসলমানদের আধিপত্য কতটা প্রভাবশালী ছিল তারই প্রমাণ পাওয়া যায় এই উক্তি থেকে।

তৎকালীন সময়ে সমাজে ছল-কপটতার ছবি দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ এতটাই অর্থলোভী হয়ে যায় যে, যেকোন উপায়ে মানুষদের ঠকিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে পিছুপা হত না। তা বোঝাতে দেবী বলছেন -

"মিথ্যা নখ চুলধারী কেহ হবে ব্রহ্মচারী
মৎস্য খায়্যা বলাবে সন্ন্যাসী।
কপট বৈষ্ণব বেশে কেহ বা ভ্রমিবে দেশে
পরধনে হয়্যা অভিলাষী।।"[২০]

এ থেকে প্রথম পালায় বর্ণিত আঠারো শতকে বাংলা তথা বাঙালির অবস্থানটা ঠিক কেমন ছিল তা অনুধাবন করা যায়।

নিত্যানন্দের দ্বিতীয় পালা 'তিল ভঙ্গ পালা' এই পালাটি অসম্পূর্ণ হলেও এখানে তৎকালীন সময়ে শুধুমাত্র সমাজের নিম্নশ্রেণী বা জাতি নয়, বর্ণভেদে উচ্চপদের অধিকারী ব্রাহ্মণদেরও অবস্থা কি শোচনীয় হয়ে এসেছিল তারও আভাস পাওয়া যায়। পালায় দেখা যায়, ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ শর্মা - তাঁর স্ত্রী তিনদিন হল উপবাসে আছে, দারিদ্র্যের চরম শিখরে তাঁরা পৌঁছে গেছে। তাই তাঁদের শোচনীয় দশা বা অবস্থা সম্পর্কে কবি জানাচ্ছেন -

"ব্রাহ্মণীর ছিঁড়া কানি পরিয়া ব্রাহ্মণ।
ভূদেব ভাবিয়া গেছে ভিক্ষার কারণ।।
উরু যুগে আছাদিয়া বিপ্রের কোপিনী।
কুলব্রত করা কুড়্যায় বস্যাছে ব্রাহ্মণী।।
তৈল বিনা শূন্য অঙ্গ পাগলিএ পারা।
খিদা তৃষ্ণা ভরে দুটি চক্ষে বহে ধারা।।"[২১]

এরপর দেবী লক্ষ্মী মধু মাসে তিল মোচড়ালে নারায়ণ জানায় এই তিলক্ষেত যেব্যক্তির তার বাড়িতে দেবীকে দাসী হয়ে থাকতে হবে। সেকথা মতো লক্ষ্মী-নারায়ন দুজনে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ি আত্মীয় হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ যে অর্ধশের চাল ভিক্ষা করে পেয়েছে তাই চারজনের জন্য ব্রাহ্মণীকে রাঁধতে বলে। ব্রাহ্মণ জানে অতিথি সেবা নারায়ণ সেবা তাই চরম খিদের জ্বালাতেও সে তাঁর সংস্কৃতি ত্যাগ করতে পারেনি। কিন্তু পরেরদিন বাড়ি যাবার জন্য শুধুমাত্র নারায়ণ যাবেন শুনে ব্রাহ্মণ কোনরকম সংকোচ না করেই ভগ্নিপতি রূপী নারায়ণকে বলতে বাধ্য হয়েছেন -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 439 - 446
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"দুই তিন দিন গেলে এক সন্ধ্যা খাই।
হরিদ্রা লবণ তৈল জন্ম ভরা নাই।।
পবন অন্দরে বঞ্চনা পাই অম্নি।
কেমনে আমার গৃহে রহিবে ব্রাহ্মণী।।
হরিদ্রা তৈল বিনে কেমনে হবে স্নান।
নাস্তি গন্ধ চুয়া না পাবে গুয়া পান।।"[২২]

এমন পরিস্থিতি শুধুমাত্র ব্রাহ্মণের একার নয়, তৎকালীন সময়ে প্রায় প্রত্যেক ঘরের অবস্থা।

এই পালায় আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা, দেবী লক্ষ্মী পাড়ার সকলকে খাওয়ানোর জন্য রান্না করলে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী নয়, পাড়ার যত লোকজনদের খাবার কথা আছে তারা সকলেই নিজে খাবার আগে কৃষ্ণকে নিবেদন করে তারপর ভোজন গ্রহণ করছে। এই হল আমাদের সংস্কৃতি প্রচন্ড খিদের জ্বালাতেও ভগবানকে না ভোলা। জীবনের শোচনীয় অবস্থাতেও এইসব মানুষদের ভগবানই ভরসা, তারা আশা রাখে দিনের শেষে সব ভালো হবে। তাই দেবী ব্রাহ্মণকে খেতে দিলে তিনদিন অভুক্ত থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ যা করছেন -

"বিষ্ণু স্মরি বিপ্র গিয়া বসিল ভোজনে।
লক্ষ্মীর মঙ্গল ক্ষুধা নিত্যানন্দ ভনে।।"[২৩]

এছাড়া - পাড়ার লোকজনেরাও খাওয়ার আগে যা করছে -

"শুনে সবে অন্ন কৃষ্ণে করা নিবেদন।
জয় জনার্দ্দন বলে করেন ভোজন।।"[২৪]

এই ছিল আঠারো শতকের পটভূমিকায় বাংলা তথা বাঙালির সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক অবনতির চিত্র যা কাব্যের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। একদিকে ধন্যার খিদের যন্ত্রনায় বেঁচে থাকার লড়াই অন্যদিকে কৃষ্ণ শর্মার তিন দিনের উপবাসের পরেও মানসিক ভারসাম্য না হারানোর লড়াই এটাই বোঝায় যে, সেই দিনগুলি ব্রাহ্মণ হোক কিম্বা চণ্ডাল, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলের জন্য কঠিনতম সময় ছিল। কাব্যটি তাই শুধুমাত্র একটি ধর্মীয়কাব্য হয়ে থাকেনি, তা আঠারো শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক দলিল হিসেবেও গুরুত্ব লাভ করেছে। বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যে, কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; তার প্রেক্ষাপট যে, বহু আগে থেকে তৈরি হয়ে এসেছে কাব্যটি এই সত্যতাকে প্রমাণ করছে। সুতরাং, নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর 'লক্ষ্মীর জাগরণ পালা' কাব্যটি আঠারো শতকের সমাজদর্পণ হিসেবে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।

Reference:

১. চক্রবর্তী, কবি নিত্যানন্দ : 'লক্ষ্মীর জাগরণ পালা', সহজপাঠ ও সহজিয়া; প্রথম প্রকাশ ৮ এপ্রিল ২০১২, পৃ. ১৮
২. মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র (সম্পাদক) : মনুসংহিতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৮৭৮
৩. প্রাগুক্ত, সূত্র -১, পৃ. ২০
৪. তদেব, পৃ. ৩১
৫. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীন্দ্রমোহন : 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা [১১০০-১৯০০ খ্রী:]', সাহিত্য সংসদ্, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, পৃ. ২০৮
৬. প্রাগুক্ত, সূত্র - ১, পৃ. ৩৫
৭. তদেব, পৃ. ৪৩
৮. তদেব, পৃ. ৪২
৯. তদেব, পৃ. ৪২-৪৩

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 48
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 439 - 446
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১০. তদেব, পৃ. ৪৭-৪৮
১১. তদেব, পৃ. ৪৮
১২. তদেব, পৃ. ৩৬
১৩. তদেব, পৃ. ৩৮
১৪. তদেব, পৃ. ৩৮-৩৯
১৫. তদেব, পৃ. ৩৯
১৬. তদেব, পৃ. ৩৯
১৭. তদেব, পৃ. ৩৯
১৮. তদেব, পৃ. ৫৬
১৯. তদেব, পৃ. ৫৬
২০. তদেব, পৃ. ৫৮
২১. তদেব, পৃ. ৮১
২২. তদেব, পৃ. ৮৭-৮৮
২৩. তদেব, পৃ. ৯৪
২৪. তদেব, পৃ. ৯৬

Bibliography:

চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীন্দ্রমোহন : ‘বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা [১১০০-১৯০০ খ্রী:]’, সাহিত্য সংসদ্, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল
চক্রবর্তী, কবি নিত্যানন্দ : ‘লক্ষ্মীর জাগরণ পালা’, সহজপাঠ ও সহজিয়া; প্রথম প্রকাশ ৮ এপ্রিল ২০১২
মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার : ‘বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী)’; কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫
মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র (সম্পাদক) : মনুসংহিতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, চতুর্থ সংস্করণ
সুর, অতুল : ‘আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী’; সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৯২